ভূগোল



পঞ্চম শ্রেণী

ভূগোল

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার

প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার

নব-সচিবালয়

কলিকাতা-৭০০ ০০১

পঞ্চম সংস্করণ

জানুয়ারি ১৯৯০

ষষ্ঠ সংস্করণ

জানুয়ারি ১৯৯১

নভেম্বর ১৯৯১

মুদ্রাকর

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভূগোলের নতুন বই প্রকাশিত হল। বইখানি নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। বইখানি পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সংক্ষেপে নিজেদের দেশ ও প্রতিবেশী দেশগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে সমর্থ হবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মানচিত্রও বইখানিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হল।

বইখানিকে আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবোধক করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব অবশ্যই বিবেচিত হবে।

নব-সচিবালয়, ৭ম তল,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভারতের কথা : ১-১৬

প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণে ভারতের সম্পদের কথা। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের অবস্থান ও দেশের চারিপাশ। ভারতের প্রাকৃতিক গঠন—পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি। প্রধান নদ-নদী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের সম্পদ : ১৭-২৯

বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও উৎপন্ন দ্রব্য। জলবায়ুর প্রভাব ও কৃষি। খনিজ সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

দেশের মানুষ : ৩০-৩২

বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক মিলন।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের প্রতিবেশী : ৩৩-৩৯

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, তাদের ভাষা, পোশাক, গৃহ, খাদ্য ও জীবনযাত্রা—আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা।

পঞ্চম অধ্যায়

আমাদের পৃথিবী : ৪০-৪৩

মহাদেশ, মহাসাগর, মহাশূন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য : ভারতবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল।

প্রথম অধ্যায়

ভারতের কথা

প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণে ভারতের সম্পদের কথা। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের অবস্থান ও দেশের চারিপাশ। ভারতের প্রাকৃতিক গঠন—পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি। প্রধান নদ-নদী।

প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণে ভারতের সম্পদের কথা

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এদেশে বাস করি, তাই আমরা ভারতবাসী। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ—এশিয়া ; ভারত তারই দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত। মহাদেশের অংশ হলেও ভারত এত বড়ো দেশ আর এত বৈচিত্র্য এখানে যে, একে উপমহাদেশও বলা হয়। যুগ যুগ ধরে কত জাতি, কত ধর্ম, কত ভাষা সমৃদ্ধ করেছে এই দেশকে। অনেকদিন আগে পৃথিবীর অল্প যে কটি দেশে প্রথম সভ্যতার আলো বিকশিত হয়েছিল, ভারতবর্ষ তাদের মধ্যে একটি। ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান—সব মিলিয়ে ভারতের সভ্যতা ও সেই সঙ্গে এদেশের অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। এদেশের মানুষ অন্য দেশে গেছেন বাণিজ্য করতে, ধর্মপ্রচার করতে আর রাজ্যবিস্তার করতে। আবার প্রাচুর্যের আকর্ষণে মাঝে মাঝেই দেশ-বিদেশ থেকে রাজারা ছুটে এসেছেন ভারতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজ্য জয় করে, ধনসম্পদ লুট-পাট করে নিয়ে গেছেন, কেউ কেউ এদেশে থেকে রাজত্বও করেছেন। তারপর কখন ধীরে ধীরে ভারতের জল-মাটি-বাতাসকে তাঁরা ভালবেসে ফেলে একাত্ম হয়ে গেছেন এই মাটির সঙ্গে।

এখন প্রশ্ন এই, এত সব খবর আমরা জানলাম কিভাবে ? অতীতের লুপ্ত নিদর্শন আবিষ্কারে যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা অনেকদিন ধরে নানা জায়গা থেকে এইসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের কাহিনী সত্যিই রোমাঞ্চকর। এঁদের বর্ণনায় প্রাচীন ভারতের অনেক অন্ধকার অজানা অধ্যায় আমাদের সামনে আলোকিত হয়েছে। আমাদের পুরনো পুঁথিপত্র,

বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রলিপি, সৌধ, বিভিন্ন যুগের মুদ্রা, সিলমোহর ইত্যাদি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এছাড়া এদেশের অতীত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন কালে ভারতে আগত বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে।

পর্যটক কাকে বলে ? এই শব্দটির অর্থ ভ্রমণকারী। ভারতের বাইরের নানা দেশ থেকে যে-সমস্ত মানুষ শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছেন তাঁদেরই আমরা পর্যটক বলতে পারি। এইসব পর্যটকরা ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রভৃতির বিবরণ চোখে দেখে বই লিখে গেছেন। আজকের পৃথিবীতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া কিছু কঠিন নয়। কিন্তু যখন রেলগাড়ি বা এরোপ্লেন ছিল না, তখন পায়ে হাঁটাই ছিল একমাত্র উপায় এবং কাজটি মোটেই সহজ ছিল না।

বিভিন্ন পর্যটকদের মধ্যে **মেগাস্থিনিসই** সর্বপ্রথম ভারতে আসেন। তিনি পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাসের দূত ছিলেন। সেই সময়ে ভারতে রাজত্ব করছিলেন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর রাজধানী ছিল **পাটলিপুত্র**। এই পাটলিপুত্রেরই বর্তমান নাম পাটনা। মেগাস্থিনিস ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে সড়কপথে পাটলিপুত্রে আসেন। তাঁর বিবরণে ভারতের আকৃতি ও পরিমাপের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর রচিত **ইন্ডিকা** বইতে তিনি উত্তর ভারতের দুটি বড়ো বড়ো নদীর কথা বলেছেন—**গঙ্গা** ও **সিন্ধু**। এই দুই নদী ও তার **শাখাপ্রশাখা** যাতায়াত ও বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হত। বর্ষা ঋতুতে যখন দু'কূল ছাপিয়ে প্লাবন দেখা দিত নদীতে, তখনই শুধু জলপথ কিছুদিন বন্ধ থাকত। দেশ-শাসন, সৈন্যচলাচল ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বড়ো বড়ো সড়কও ছিল। তার মধ্যে পাটলিপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিমের রাজপথটি ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। উর্বর মাটিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। কাজেই ভারতীয় সভ্যতারও যথেষ্ট বিকশিত হওয়ার সুযোগ ছিল। দেশ-বিদেশের সঙ্গে এই সূত্রে সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।

মেগাস্থিনিসের মতে পাটলিপুত্রই ছিল সবচেয়ে বড়ো নগর। ভারতীয়রা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই চাষবাসে সময় দিতেন। ভারতের মনোরম জলবায়ু ও পলিগঠিত উর্বর সমতলভূমি শীত ও বর্ষা এই দুই ঋতুতে বছরে দুবার ফসল তোলায়

সাহায্য করত। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, গম, যব, ডাল, জোয়ার, বাজরা, রাগি, আখ, তুলা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

মেগাস্থিনিসের সাতশো বছর পরে চীনদেশ থেকে **ফা-হিয়েন** ভারতে আসেন। তিনি যে বই লেখেন তার নাম **বৌদ্ধ রাজ্যসমূহের বিবরণ**। ফা-হিয়েন যখন ভারতে আসেন তখন ভারতের সিংহাসনে ছিলেন **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** বা **বিক্রমাদিত্য**। ফা-হিয়েনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। প্রায় চোদ্দ বছর ফা-হিয়েন ছিলেন দেশছাড়া। তার মধ্যে ছ' বছর ভারতে ও দু' বছর সিংহলে (বর্তমানে **শ্রীলঙ্কা**) কাটে। তিনি সেই সময়ের যে বিবরণ লিখে গেছেন তাতে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে রাজধানী ছিল দুটো—**পাটলিপুত্র** এবং **উজ্জয়িনী**। ফা-হিয়েন বেশ কিছুদিন পাটলিপুত্রে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ-পূর্বের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র **তাম্রলিপ্ত** বা **তমলুক** থেকে সিংহলের দিকে সমুদ্রযাত্রা করেন। মোট ছ' বছর তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্প-সংস্কৃতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারত তখন গৌরবের শিখরে। কাব্যে মহাকবি **কালিদাস**, গণিতে **আর্যভট্ট**, জ্যোতিষে **বরাহমিহির**—এঁরা সকলে বিক্রমাদিত্যের সভা অলংকৃত করেছিলেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের শিল্পীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই যুগেই সংস্কৃত ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি মহাগ্রন্থ সম্পাদিত ও গ্রন্থিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে। এ সময় বিজ্ঞানচর্চারও সূচনা হয়। গণিতশাস্ত্রের ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যতত্ত্ব এই যুগের বড়ো আবিষ্কার। পৃথিবী যে তার অক্ষের উপর নিজের মেরুবিন্দুর চারদিকে ঘুরছে এবং পৃথিবীর আবর্তনের জন্য দিন-রাত্রি সংগঠিত হচ্ছে —এ সত্য **আর্যভট** এই সময় আবিষ্কার করেন। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ব্যাখ্যাও আর্যভটেরই কীর্তি। যদিও দশমিক প্রথা আর্যভটের আগেই উদ্ভাবিত হয়েছিল, কিন্তু আর্যভটই প্রথম তা প্রয়োগ করেন। সূর্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী **বরাহমিহির** গুপ্ত-যুগের গৌরব। অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র, সাঁচী-সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা—গুপ্তযুগেরই সৃষ্টি। সব মিলিয়ে ফা-হিয়েনের আমলের ভারতবর্ষ যেন এক গৌরবময় স্বপ্নের দেশ ছিল বলে মনে হয়।

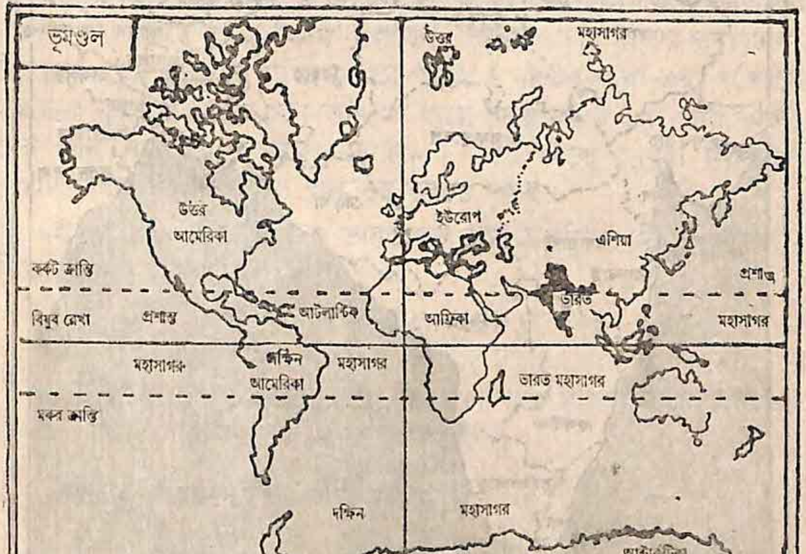
ফা-হিয়েনের দুশো বছর পরে **হিউয়েন সাঙ** চীনদেশ থেকে ভারতে আসেন। **পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত** নামে বারোটি খণ্ডে তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী লিখে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বিবরণ ছিল মূলত উত্তর ভারত সম্বন্ধে। হিউয়েন সাঙ সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ আজও অত্যন্ত মূল্যবান বলে ঐতিহাসিকরা মনে করে থাকেন। বৌদ্ধবিহার ও তীর্থস্থানগুলির অবস্থান নির্ণয়, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বেশ কিছু তথ্য, রাজা হর্ষনাথ ও চীন সম্রাটের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কস্থাপন ও দূতবিনিময় হিউয়েন সাঙের আগ্রহেই সম্ভব হয়েছিল।

এরপর ভারতে আসেন **আবুরেহান** বা **অল্-বিরুনি** নামে একজন পণ্ডিত। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়। একাদশ শতাব্দীতে, গজনির সুলতান মামুদের সময়ে তিনি ভারতে ছিলেন। তাঁর **ভারত-বিবরণ** গ্রন্থে তিনি ভারতের সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে মূল্যবান সব তথ্য লিখে গেছেন। পর্যটকদের মধ্যে তিনিই প্রথম উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমির গঠন সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত রেখে যান। তাঁর মতে বর্তমান উত্তর ভারতের জায়গায় আগে একটি বিশাল সমুদ্র ছিল। উত্তরের হিমালয় পর্বত থেকে যে বড়ো বড়ো নদীগুলি নেমে এসেছে, তাদের পলি ভরাট হয়েই এই সমভূমির জন্ম। এছাড়া ভারতের উন্নত, গ্রহবিজ্ঞান, পৃথিবী গ্রহ, তার আকার ও গতি, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা এবং গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিবরণও আছে তাঁর বইয়ে। আর তাঁর অনেক তথ্যই সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা।

বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণ ভারতের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করে। ভারতবাসী হিসাবে এই সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারা আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য এদেশের ভৌগোলিক পরিবেশকে ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

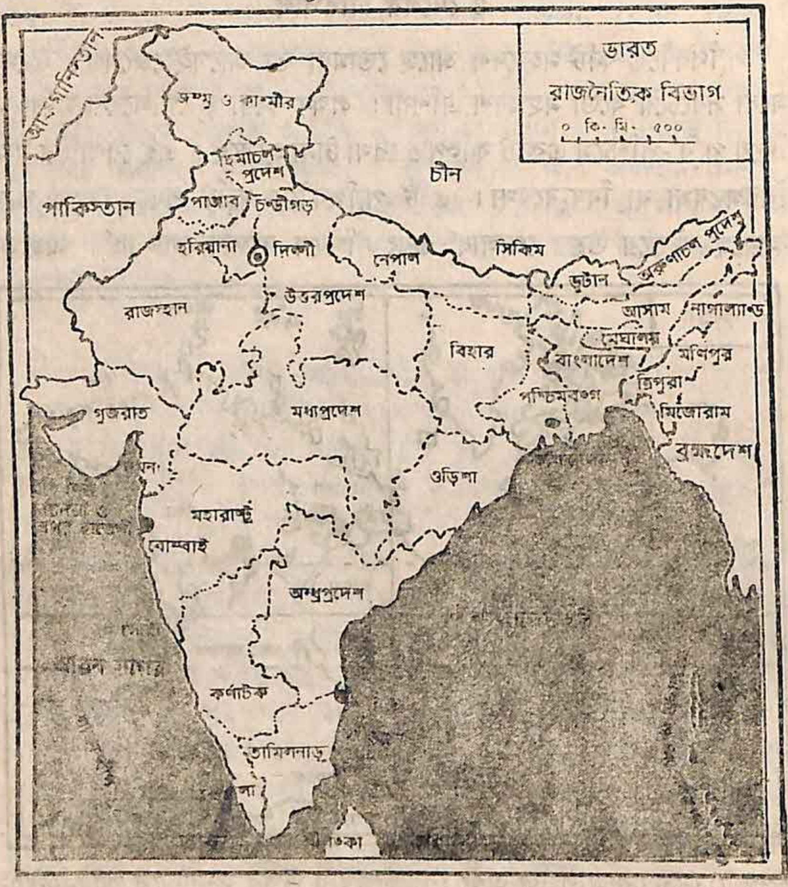
পৃথিবীর মধ্যে ভারতের অবস্থান ও দেশের চারিপাশ

পৃথিবীতে কটি মহাদেশ আছে তোমরা আগেই জেনেছ। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ এশিয়া। লক্ষ্য করো ভূ-গোলকের মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে একটি কল্পিত রেখা টানা হয়েছে। এই রেখাটির নাম **নিরক্ষরেখা** বা **বিষুবরেখা**। এটি পৃথিবীকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে—উত্তরে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণে দক্ষিণ গোলার্ধ। এছাড়া



উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি এবং নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে আর-একটি রেখাও কল্পনা করা হয়েছে। এটিকে **মূল মধ্যরেখা** বলা হয়। এই মূল মধ্যরেখার পূর্বদিকের অংশকে পূর্ব গোলার্ধ এবং পশ্চিমদিকের অংশকে পশ্চিম গোলার্ধ বলে। আমাদের মাতৃভূমি ভারত এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণদিকে একটি ত্রিভুজের আকারে পূর্ব গোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে এবং উত্তর গোলার্ধের মধ্যে অবস্থিত। এই সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান

এবং তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত থাকায় স্থলপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছে।



মানচিত্রে লক্ষ্য করো, কতগুলি স্থলভাগ ও জলভাগ ভারতকে বেষ্টন করে আছে। ভারতের উত্তর সীমায় চীন, নেপাল ও ভুটান, পূর্বদিকে বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ও ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরবসাগর, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।

ভারতের প্রাকৃতিক গঠন

পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি

তোমরা নিশ্চয়ই কবিতার এই কটি লাইনের সঙ্গে পরিচিত—

'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ...'

এটি কার লেখা বলতে পার ? বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর।

এ রকমই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রথম নভশ্চর শ্রীরাকেশ শর্মা ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল তারিখে। মহাশূন্য থেকে ভারতের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'ভারতমাতার মাথায় তুষারঢাকা হিমালয়, যেন মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিমে সমুদ্রের নীল জলরাশি যেন তাঁর পা ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর সমস্ত দেহ যেন সবুজের আচ্ছাদনে ঢাকা...।' এই দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি বলে প্রত্যেকে গর্ব অনুভব করতে পারি।

এই বর্ণনার ভিত্তিতে সমগ্র ভারত ভূখণ্ডকে চারটি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়—

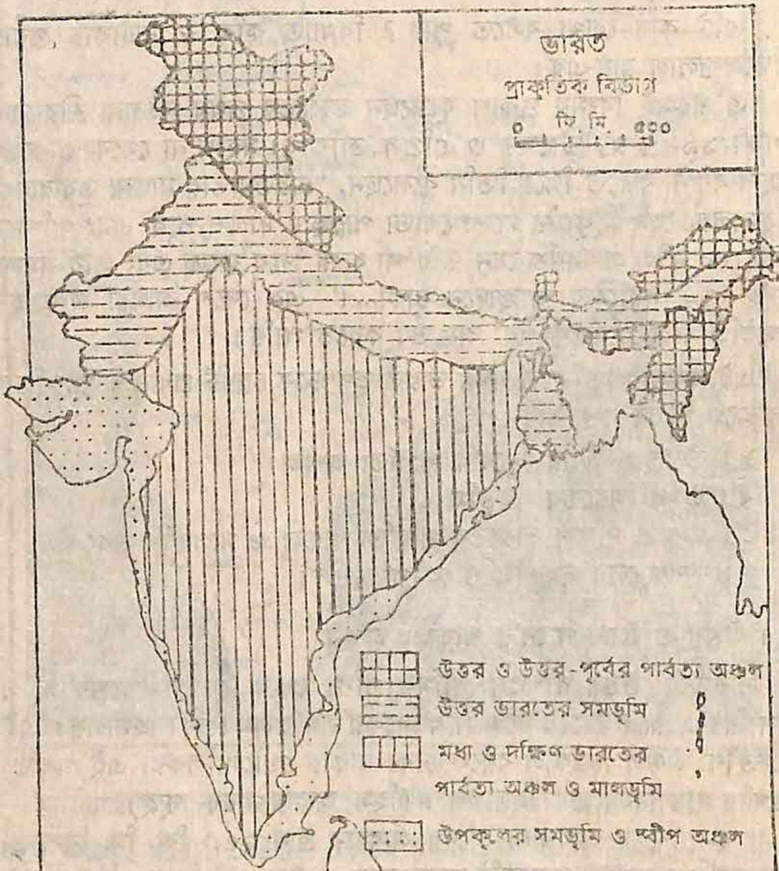
১। উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল।
২। উত্তর ভারতের সমভূমি।
৩। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমি এবং
৪। উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ অঞ্চল।

১। উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পামির গ্রন্থি থেকে যে পর্বতশ্রেণীগুলি প্রসারিত হয়েছে তাদের মধ্যে পূর্বদিকের সর্বপ্রধান শ্রেণী হিমালয়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকাল বরফে ঢাকা থাকায় ভৌগোলিকরা এই পর্বতশ্রেণীর নাম দিয়েছেন 'হিমালয়'। (হিম+আলয়=বরফ+গৃহ)

পূর্ব-পশ্চিমে আধখানা চাঁদের আকারে প্রায় ২৫০ কি. মি. বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা কয়েকটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী নিয়ে গঠিত। এই পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিমদিক যথেষ্ট চওড়া—৪০০ কি. মি. ; কিন্তু পূর্বদিক ক্রমশ সরু—১৫০ কি. মি.। সমান্তরাল শ্রেণীগুলি দক্ষিণ

থেকে উত্তরে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। একটি শ্রেণী অন্যটি থেকে বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও মালভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণদিকের শ্রেণীটির উচ্চতা সবচেয়ে কম—৬০০-১,৫০০মি.। সেজন্য এর নাম নিম্ন-হিমালয় বা **অবহিমালয় বা শিবালিক**। অবহিমালয়ের উত্তরে **মধ্যহিমালয় বা হিমাচল**,



উচ্চতা গড়ে ৫,০০০ মি.। তার উত্তরে **প্রধান হিমালয় বা হিমাদ্রি বা হিমগিরি**, উচ্চতা গড়ে প্রায় ৬,০০০ মি.। শৃঙ্গগুলি উচ্চতায় ৮০০০ মিটারেরও পরে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **মাউন্ট এভারেস্ট**—৮,৮৪৮ মি. নেপাল-তিব্বত

সীমান্তে অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে **কারাকোরাম** পর্বতশ্রেণীর **গডউইন অস্টিন** বা K_2 শৃঙ্গ—৮,৬১১ মি. পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ, ভারতে অবস্থিত। আর **কাঞ্চনজঙ্ঘা**—৮,৫৯৮ মি. পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। অন্যান্য শৃঙ্গগুলির মধ্যে ধবলগিরি, নাঙ্গা পর্বত, নন্দাদেবী, চৌখাম্বা, ত্রিশূল, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, কামেট ও মাকালু ইত্যাদির নাম করা যায়। **বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ** হিন্দুদের পরমতীর্থ।

এই অঞ্চলে অসংখ্য হিমবাহ দেখা যায়। এই হিমবাহগুলি থেকেই উত্তর ভারতের নদীসমূহ—পশ্চিমদিকে সিন্ধু, গঙ্গা ও পূর্বদিকে **ব্রহ্মপুত্রের** উৎপত্তি। নদীগুলিতে সারা বছরই বরফগলা জল থাকে। বর্ষাকালে এর সঙ্গে বৃষ্টির জল মিলিত হয়ে প্লাবন দেখা যায়। পর্বতশ্রেণীর দুর্ভেদ্যতার জন্য যাতায়াত প্রায় অসম্ভব। কেবলমাত্র গিরিপথগুলি জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলাচলের যোগ্য। অন্য সময়ে প্রচুর বরফের জন্য রাস্তা বন্ধ থাকে।

হিমালয়ের পশ্চিম ও পূর্বদিক থেকে পর্বতশ্রেণীগুলি দক্ষিণে বেঁকে গিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীগুলির মধ্যে হিন্দুকুশ, সুলেমান ও খিরথর পর্বতমালা বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। হিমালয়ের পূর্বদিক থেকে কয়েকটি পাহাড়-পর্বত ভারতকে ব্রহ্মদেশ থেকে আলাদা করেছে। সেগুলি হল পাটকই, নাগা, মিকির, বরাইল, লুসাই, মিজো ও আরাকানইয়োমা।

পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত-ব্যবস্থা অনুন্নত এবং জীবনযাত্রাও কষ্টকর। পাথরের মাঝে মাটির অভাব থাকায় চাষবাসেও অসুবিধা হয়। সেজন্য জনবসতি খুবই কম। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসের ফলে অধিবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী আর সাহসী। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বহু উপজাতির বাসভূমি।

২। উত্তর ভারতের সমভূমি

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে এই সমভূমি অবস্থিত। এই বিশাল সমভূমি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২,৪০০ কি. মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ২৪০-৪০০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও এদের অসংখ্য উপনদী হিমালয় থেকে এবং বিশেষ করে

প্লাবনের সময় প্রচুর পলি এনে এই বিস্তীর্ণ সমভূমি গড়ে তুলেছে। সমভূমিটি উচ্চতায় উত্তরদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটারের বেশি উঁচু নয় এবং দক্ষিণদিকে অধিকাংশ স্থান প্রায় সমুদ্র-সমতলে। এই সমভূমির পশ্চিমদিকে একটি পর্বতশ্রেণী উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। উচ্চ অংশ থেকে ভূমির ঢাল দু'দিকে গিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধুর সমভূমি ক্রমশ ঢালু হয়ে আরবসাগরের দিকে উপকূলে মিশেছে। অন্যদিকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি দক্ষিণ-পূর্বে ঢালু হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে, আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিমে, ভারতের একমাত্র মরুভূমি 'থর' অবস্থিত। অঞ্চলটির সর্বত্রই শুধু বালি আর বালি এবং বৃষ্টিপাত নেই বললেই চলে। এ কারণে এখানে যে গাছপালাগুলি জন্মায়, সেগুলি আকৃতিতে ছোটো, গায়ে কাঁটা এবং পাতা ও বাকলগুলি পুরু। এই গাছগুলির শিকড় মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করে জল সংগ্রহ করে।

৩। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমি

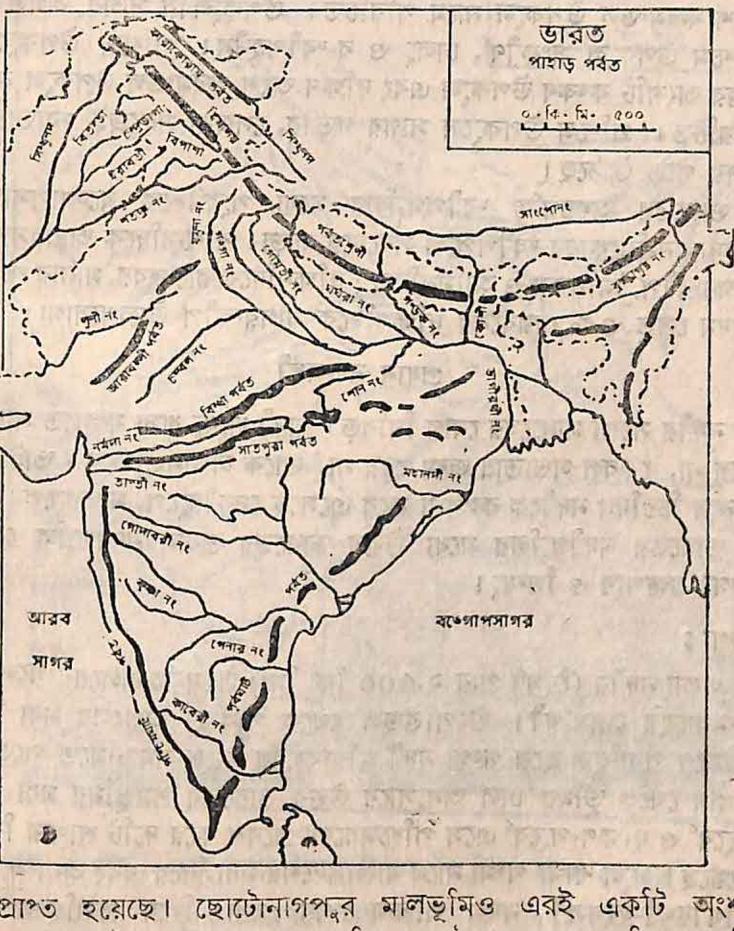
উত্তরের সমভূমির দক্ষিণদিক থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত। বিন্ধ্যপর্বত দ্বারা সমগ্র অঞ্চলটি দুটি অংশে বিভক্ত। যথা, উত্তরের অপ্রশস্ত **মধ্যভারতের মালভূমি** এবং **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি**।

নর্মদা নদীর গ্রস্ত উপত্যকাকে মধ্যভারতের মালভূমির দক্ষিণ প্রান্ত হিসাবে গণ্য করা যায়। এই মালভূমির পশ্চিমদিকে মালবের মালভূমি এবং পূর্বদিকে ছোটোনাগপুর মালভূমি। **আরাবল্লি** এবং **বিন্ধ্য** পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন পর্বত। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট** বা **সহ্যাদ্রি** ও পূর্বে **পূর্বঘাট** বা **মহেন্দ্রগিরি** পর্বতমালা অবস্থিত। এই মালভূমির আকার অনেকটা ত্রিভুজের মতো। পশ্চিমঘাট এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা দক্ষিণদিকে নীলগিরি পাহাড়ে মিশেছে।

নীলগিরির সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটির নাম **দোদাবেতা** (২,৬৩৭ মি.)। পাহাড়ের সংযোগস্থলে **আনাইমুদি** (২,৬৯৫ মি.)—এটি দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদী মালভূমির ঢাল অনুসরণ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত। পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মধ্যে নর্মদা, তাপি

(তাপ্তি), মাহী ও সবরমতীর নাম করা যায়। পশ্চিমে রাজস্থানের লুনি নদী কচ্ছের রান-এ (বিস্তৃত নোনা জলের জমি) পড়েছে।

এই বিশাল মালভূমিটি ভারতের প্রাচীনতম অংশ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে রোদ, বৃষ্টি, বাতাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির প্রভাবে মালভূমিটি



ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ছোটোনাগপুর মালভূমিও এরই একটি অংশ। দাক্ষিণাত্যের উপকূলে যে অংশগুলি যথেষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি সেগুলি পাহাড়-পর্বতের আকারে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন—পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট। এদের মধ্যে পশ্চিমঘাট পূর্বঘাটের চেয়ে উঁচু।

৪। উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ অঞ্চল

ত্রিভুজাকৃতি মালভূমিটির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে উপকূলীয় সমভূমি গড়ে উঠেছে। পূর্ব উপকূল প্রশস্ত এবং এখানে অনেক ব-দ্বীপ দেখা যায়। পূর্ব উপকূলের উত্তর অংশ **উত্তর সরকার উপকূল** এবং দক্ষিণ অংশ **করমণ্ডল উপকূল** নামে পরিচিত। উপকূলীয় সাগর অগভীর। পশ্চিম উপকূল সংকীর্ণ, ঢালু ও ব-দ্বীপহীন। পশ্চিম উপকূলের উত্তর অংশটি **কঙ্কণ উপকূল** এবং দক্ষিণ অংশ **করমণ্ডল উপকূল** নামে পরিচিত। পশ্চিম উপকূলে সাগর গভীর, সেজন্য সহজেই স্বাভাবিক বন্দর গড়ে উঠেছে।

ভারতের অন্তর্গত দ্বীপগুলির মধ্যে পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বড়ো। পশ্চিমদিকে আরবসাগরে লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভ ; দক্ষিণদিকে রামেশ্বর, মানার দ্বীপ, আদম সেতু ও সুন্দরবনের দক্ষিণদিকে সাগরদ্বীপ উল্লেখযোগ্য।

প্রধান নদ-নদী

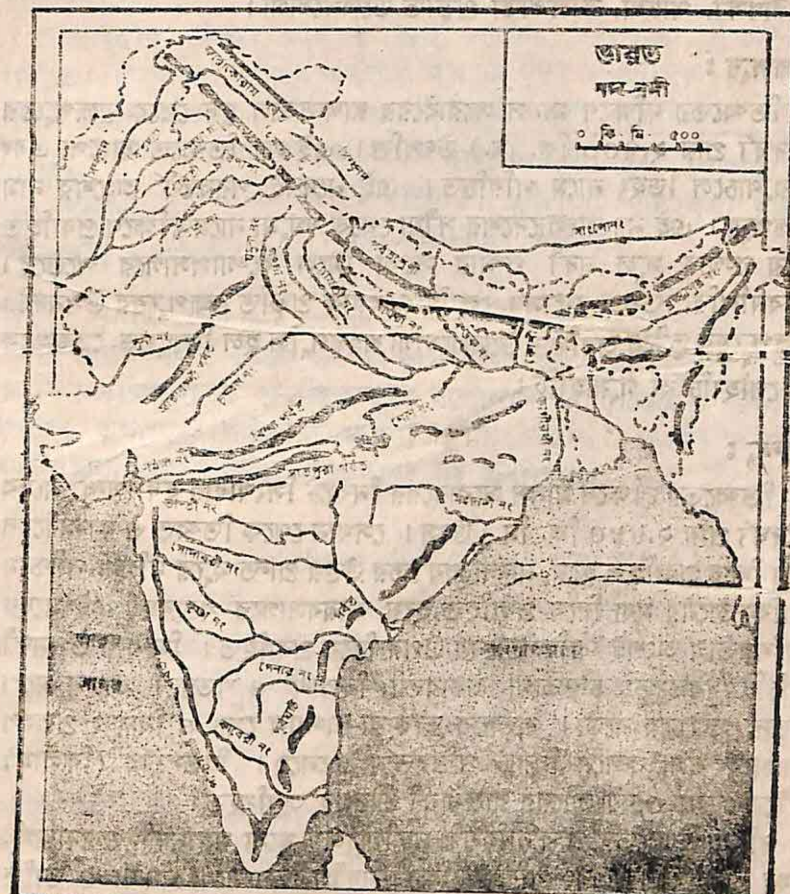
নদীর সঙ্গে মানুষের যোগ নিবিড়। নদী শুধু শস্য ফলাতে সাহায্য করে না, কেবল সভ্যতার জন্ম দেয় না, তাকে লালনও করে। তাই তো মানুষ চিরদিন নদীকে কল্পনা করে এসেছে দেবীরূপে, মাতৃরূপে।

ভারতের নদীগুলির মধ্যে উত্তর ভারতের প্রধান নদীগুলি হল—**গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু।**

গঙ্গা ঃ

গঙ্গা নদীর (দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫০০ কি. মি.) উৎস হিমালয়ের **গঙ্গোত্রী** হিমবাহের **গোমুখী**। উৎপত্তিস্থল থেকে পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা নদী হরিদ্বারের কাছে সমভূমিতে পড়েছে। এখান থেকে ভূমির ঢাল অনুসারে উত্তর ভারতের সমভূমির মধ্য দিয়ে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে এসে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। মূল শাখা **পদ্মা** নামে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এবং অন্য শাখাটি **ভাগীরথী-হুগলী** নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। যেসব নদী বড়ো নদীতে এসে মিলিত হয় সেগুলি **উপনদী** এবং মূল নদী থেকে যে-সমস্ত শাখা সাগর বা

উপসাগরে পড়ে সেগুলিকে **শাখানদী** বলে। নদীপ্রবাহের ডানতীরের নদীগুলিকে দক্ষিণ বা **ডানতীরের নদী** এবং বামতীরের নদীগুলিকে **বামতীরের নদী** বলে। গঙ্গার ডানতীরের উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা,



চম্বল ও শোন এবং বামতীরের উপনদীগুলির মধ্যে গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমস্ত উপনদীগুলির মধ্যে যমুনাই সর্বপ্রধান। যমুনা নদী প্রয়াগ বা এলাহাবাদে গঙ্গায় মিশেছে। গঙ্গার

শাখানদীগুলির মধ্যে জলঙ্গী, ইছামতী ও মাথাভাঙার নাম করা যায়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার ব-দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো।

গঙ্গার তীরে অনেক নগর গড়ে উঠেছে—তার মধ্যে **কানপুর, বারাণসী, পাটনা, কলিকাতা** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মপুত্র ঃ

তিব্বতের দক্ষিণে মানস সরোবরের **রাক্ষসতাল হ্রদ** থেকে ব্রহ্মপুত্রের (দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৭০০ কি. মি.) উৎপত্তি। এই নদ তিব্বতে **সাংপো** এবং অরুণাচলে ডিহং নামে পরিচিত। এই নদেরই পরবর্তী অংশের নাম ব্রহ্মপুত্র। এই নদ বাংলাদেশের সীমা থেকে যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার মূল নদী পদ্মার সঙ্গে মিলে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। সুবনশিরি, তিস্তা, তোর্সা, লোহিত, বরাক প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হল ডিব্রুগড়, তেজপুর ও গৌহাটি বা গুয়াহাটি।

সিন্ধু ঃ

তিব্বতের দক্ষিণে মানস সরোবরের নিকটে **সিংখাবার হ্রদ** সিন্ধু নদের (দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৮৮০ কি. মি.) উৎস। সেখান থেকে তিব্বত ও কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, নাঙ্গা পর্বতের উত্তর প্রান্ত ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরবসাগরে পড়েছে। এই নদের বেশিরভাগ অংশই পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত। সিন্ধুর উপনদী পাঁচটি—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু। এদের মধ্যে শতদ্রু সবচেয়ে বড়ো। শতদ্রুর **ভাকরা-নাঙ্গাল** সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প পাঞ্জাবে শস্য ফলনে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। বিতস্তার (ঝিলাম) তীরে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী **শ্রীনগর** অবস্থিত।

দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাহিনী নদীগুলির মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী এবং পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মধ্যে নর্মদা ও তাপি (তাপ্তি) উল্লেখযোগ্য।

মহানদী ঃ

মধ্যপ্রদেশের মালভূমি অঞ্চল থেকে মহানদীর (দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ কি. মি.) উৎপত্তি। এখান থেকে মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার মধ্য দিয়ে

প্রবাহিত হয়ে মহানদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মহানদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত কটক উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র।

গোদাবরী ঃ

গোদাবরীর (দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৪৪০ কি. মি.) উৎপত্তি পশ্চিমঘাট পর্বতে। গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম নদী অববাহিকা। কোনো একটি বড়ো নদীর উপনদী ও শাখানদী-বিধৌত সমগ্র অঞ্চলকে ঐ নদীর [illegible] বলে। গোদাবরীকে **দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা** বলে। গোদাবরীর **অববাহিক**[illegible] [illegible] প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী, মঞ্জীরার নাম করা যায়। উপনদীগুলির মধ্যে [illegible] দিকে রাজামান্দ্রী অবস্থিত। গোদাবরীর ব-দ্বীপের উত্তর[illegible]

কৃষ্ণা ঃ

পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে কৃষ্ণা নদী (দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ কি. মি.) দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কৃষ্ণার উপনদী তুঙ্গভদ্রা, ঘাটপ্রভা, মুসী, ভীমা প্রভৃতি। কৃষ্ণার তীরে **বিজয়ওয়াড়া** এবং মুসীর তীরে **হায়দ্রাবাদ** অবস্থিত।

কাবেরী ঃ

পশ্চিমঘাট পর্বতে ব্রহ্মাগিরি কাবেরীর (দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ কি. মি.) উৎস। সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে কাবেরী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদীকে অনেকে **দক্ষিণের গঙ্গা** বলেন। সিমসা, অমরাবতী এর উপনদী। কাবেরীর তীরে **তিরুচিরাপল্লী** হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র। কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে যথেষ্ট চাষবাস হয়।

নর্মদা ঃ

মহাকাল পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে নর্মদা নদী (দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৩১০ কি. মি.) পশ্চিমদিকে গিয়ে **খাম্বাত (কাম্বে)** উপসাগরে পড়েছে। এই নদীর তীরে **জব্বলপুর** উল্লেখযোগ্য শহর। এই নদীর মোহনায় **ব-দ্বীপ** নেই।

তাপি ঃ

তাপির (দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২৫ কি. মি.) উৎপত্তি **মহাদেব পর্বতে**। এই নদী খাম্বাত উপসাগরে পড়েছে। **সুরাট** বন্দর এই নদীর মোহনায় অবস্থিত।

অনুশীলনী

১। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর বলো :

ক) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ কোন্‌টি ?

খ) ভারত তার কোন্‌ দিকে অবস্থিত ?

গ) 'পর্যটক' কাকে বলে ? কোন্‌ পর্যটক সর্বপ্রথম ভারতে আসেন ? তিনি কার দূত ছিলেন ?

ঘ) ফা-হিয়েন কে ? তিনি কোন্‌ দেশ থেকে ভারতে আসেন ? সে সময়ে ভারতের সিংহাসনে কে ছিলেন ? তিনি কত বছর ভারতে ছিলেন ?

ঙ) ভারত ভূখণ্ডকে ক'টি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং বিভাগগুলি কী কী ?

চ) ভারতের প্রধান নদ-নদীর নাম লেখো।

২। ভারতের মানচিত্র অঙ্কন করে প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চল দেখাও।

৩। ভারতের চতুঃসীমা বর্ণনা করো।

৪। ভারতের প্রথম নভশ্চরের নাম কী ? তিনি কোন্‌ সালের কোন্‌ তারিখে মহাকাশে যাত্রা করেন ?

৫। ক) হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোন্‌টি ? উচ্চতা কত ?

খ) বদ্রীনাথ কি জন্য বিখ্যাত ?

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) আবার —— আকর্ষণে মাঝে মাঝেই দেশ-বিদেশ থেকে —— ছুটে এসেছেন ভারতে।

খ) মেগাস্থিনিস রচিত —— বইতে তিনি উত্তর ভারতের দুটি বড়ো বড়ো নদীর কথা বলেছেন, গঙ্গা ও ——।

গ) কৃষিজ ফসলের মধ্যে —— —— —— ও ডাল প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

ঘ) যখন রেলগাড়ি বা এরোপ্লেন ছিল না, তখন —— —— ছিল একমাত্র উপায়।

ঙ) —— আগ্রহই রাজা —— ও চীন সম্রাটের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

৭। ভুল সংশোধন করো :

ক) হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা।

খ) ভারতের একমাত্র মালভূমির নাম থর।

গ) বিষুবরেখা ভারতকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করেছে।

ঘ) ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর।

৮। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

পাটলিপুত্র, আর্যভট্ট, সাঁচী, নালন্দা, অল্‌-বিরুনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের সম্পদ

বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও উৎপন্ন দ্রব্য। জলবায়ুর প্রভাব ও কৃষি। খনিজ সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্য।

বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও উৎপন্ন দ্রব্য

পৃথিবীর গাছপালা ভূত্বকের উপরের যে সূক্ষ্ম আবরণ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে তাকে **মাটি** বলে। এই মাটি শিলাচূর্ণ ও জৈব পদার্থের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। মাটি নানা রঙের হয়। যে শিলা বা শিলাগুলি থেকে মাটি তৈরি হয়, মাটির রঙ ও উর্বরতা তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

শিলাস্তর, জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির তারতম্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মাটি দেখা যায়। যেমন—১। **পার্বত্য অঞ্চলের মাটি**, ২। **সমভূমি অঞ্চলের মাটি**, ৩। **মালভূমি অঞ্চলের মাটি** ও ৪। **উপকূলের মাটি**।

১। পার্বত্য অঞ্চলের মাটি

পার্বত্য অঞ্চলের নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতির জন্য মাটি মোটামুটি-ভাবে অনুর্বর। তবে যেখানে মাটিতে লৌহকণার ভাগ বেশি ও লতাপাতা-পচানো সার আছে এবং গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ায় না, সেখানে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চা-এর চাষ হয়। এ ছাড়া, কিছু কিছু ফলের বাগানও আছে।

২। সমভূমি অঞ্চলের মাটি

উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চলের মাটি—**গঙ্গা**, **ব্রহ্মপুত্র** ও **সিন্ধু** এই তিনটি প্রধান নদী ও এদের উপনদীগুলি দ্বারা বাহিত পলি সঞ্চয়ের ফলে গড়ে উঠেছে। মাটির উপাদানের ভিত্তিতে পলিমাটিকে ভাগ করা হয়। যে মাটিতে বালির ভাগ বেশি ও জল ধরে রাখার ক্ষমতা

কম, তথা **বেলেমাটি** সেখানে জোয়ার, বাজরা ও রাগি হয়। যে মাটিতে বালি-কাদার ভাগ সমান সমান তথা **দোআঁশ মাটি** সেখানে গম, আখ, তৈলবীজ ও সামান্য পরিমাণে ধান হয় ; যে মাটিতে কাদার ভাগ বেশি ও জল সহজেই জমে থাকে তথা **এ্যঁটেল মাটি**, সেখানে ধান ও পাট উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর উর্বর সমভূমিগুলির মধ্যে এই সমভূমির নাম বিশেষভাবে করা যায়। এই জমিতে বছরে দুটি ফসল তো হয়ই, এমনকী তিনটি ফসলও হয়। তাই এখানে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করেন।

৩। মালভূমি অঞ্চলের মাটি

মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমির পশ্চিমদিকে (মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও অন্ধ্রপ্রদেশ) লাভাজাত **কালোমাটি** বা **রেগুর** আছে। এই মাটিতে কাদার ভাগ বেশি, কাজেই তার জলধারণের ক্ষমতাও বেশি। এই মাটি কার্পাস চাষের অত্যন্ত উপযোগী। কালো মাটি ছাড়া দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্রই লাল দোআঁশ মাটি দেখা যায়। এই মাটির জলধারণের ক্ষমতা মাঝারি। সেজন্য এই মাটিতে সেচের সাহায্যে ধান, আখ ও তুলা চাষ হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশ থেকে ছোটো-নাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত যে লাল মাটি দেখা যায় তাকে **ল্যাটেরাইট** বলে। এই মাটিতে লোহার ভাগ বেশি, তাই রঙ লাল। এই মাটির **উর্বরা-শক্তি** কম হওয়ায় রাগি, বাজরা ইত্যাদি নিচু মানের দানাশস্য উৎপন্ন হয়।

৪। উপকূলের মাটি

এই মাটিতে বালি ও লবণের ভাগ বেশি। সেজন্য উপকূলে নারকেল, সুপারি, ঝাউ, সুন্দরী, গরান ইত্যাদি গাছ সহজেই হয়। অপেক্ষাকৃত অভ্যন্তরে, যেখানে বালি ও কাদা দেখা যায়, সেখানে ধানের চাষ হয়।

জলবায়ুর প্রভাব ও কৃষি

ফসল ফলানোর জন্য শুধু উর্বর মাটিই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে পরিমাণমতো জলেরও প্রয়োজন। চাষের জন্য এই জল আসে বৃষ্টি থেকে। যে অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ কম অথচ মাটি মোটামুটি উর্বর, সেখানে

বর্ষার অতিরিক্ত জলকে ধরে রেখে প্রয়োজনমতো সেচের কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদন করা হয়। কাজেই ভালো জাতের ফসল বেশি পরিমাণে পেতে হলে উপযুক্ত মাটি, উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত—সবই প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিকরা সমস্ত পৃথিবীকে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গতি প্রভৃতির ভিত্তিতে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেছেন। ভারত **মৌসুমি জলবায়ু** অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। শুষ্ক-শীত ও আর্দ্র-গ্রীষ্ম এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। 'মৌসিম' শব্দটি আরবি। এর অর্থ ঋতু। যদিও আমাদের দেশে ঋতু ছটি তবে তার মধ্যে তিনটি ঋতুরই প্রভাব ও গুরুত্ব বেশি, যেমন—**শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা।**

শীতকালে সমগ্র ভারতে উত্তাপ খুবই কম এবং পূর্ব উপকূল ছাড়া কোথাও বৃষ্টি প্রায় হয়ই না। এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে। দিনে ঝলমলে প্রাণজুড়ানো রোদ্দুরের তাপ আর রাত্তিরে আকাশে ঝকঝকে তারার বাহার। মোটামুটিভাবে আবহাওয়া আরামদায়ক। এই সময়ে উত্তরদিক থেকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু ভারতের উপর দিয়ে বয়ে যায়।

গ্রীষ্মে উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং বর্ষাকালে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে এবং আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় এখানকার মেঘালয় মালভূমির **মৌসমাইতে** বা **মৌসিনরামে** (১,২০০-১,৫০০ সে. মি.)। বৃষ্টির পরিমাণ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ক্রমশ কমতে থাকে, জলীয় বাষ্পের অভাব, যথেষ্ট উত্তাপ ইত্যাদির জন্য। রাজস্থানে বৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে কম হওয়ায় এই অঞ্চলে **থর** নামক ভারতের একমাত্র মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

এদেশে কৃষিজ ফসলকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—**খাদ্য-ফসল, তন্তু-ফসল ও পানীয়-ফসল।** খাদ্য-ফসলের মধ্যে ধান, গম, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, রাগি, আখ ; তন্তু-ফসলের মধ্যে পাট, কার্পাস এবং পানীয়-ফসলের মধ্যে চা, কফি উল্লেখযোগ্য। ধান ও গম

অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য। তবে কোথাও কোথাও জোয়ার, বাজরা, রাগিও প্রধান খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয়।

খাদ্য-ফসল

ধানঃ ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। উর্বর দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতে ২৪°-২৭° ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা এবং ১০০-২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টির প্রয়োজন। ঋতুভিত্তিক ফসল হিসাবে ধানকে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আউশ গ্রীষ্মের শুরুতে বোনা হয় এবং বর্ষার শেষে কাটা হয়। আমন ধান বর্ষাঋতুতে রোপণ করে হেমন্তকালে কাটা হয়। বোরো ধান শীতকালে রোপণ করা হয় আর গ্রীষ্মের শুরুতে কাটা হয়। জল পেলে বছরের সব সময়ই ধান চাষ সম্ভব। উত্তর-পূর্ব ভারত ও উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলে ধানের ফলন সবচেয়ে বেশি। এদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম, অন্ধ্র দ্বিতীয়, বিহার তৃতীয়। এছাড়া তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবেও প্রচুর ধান হয়।

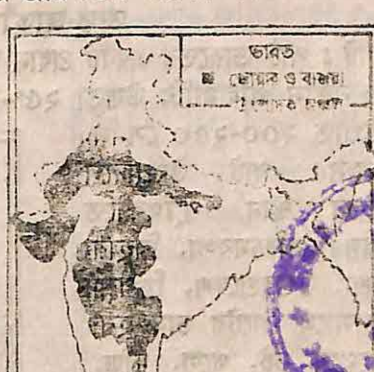


ভারতে ধানের উৎপাদন বাড়াবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি কৃষি-গবেষণার ফলে, ভালো বীজ ও জাপানি প্রথায় চাষ করে উন্নত ধরনের ধান এবং বেশি ফলন সম্ভব হয়েছে। ধান থেকে ভাত ছাড়া খই, চিঁড়ে, মুড়ি প্রভৃতি তৈরি হয়। এছাড়া ধান গাছ থেকে খড়ও পাওয়া যায়, যা ঘর ছাওয়া এবং গো-মহিষাদির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গম ঃ উর্বর নরম কাদামাটি বা দোআঁশ মাটি, ১২°-১৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা এবং ৬০-১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে আদর্শ। এদেশে শীতকালে গমের বীজ বপন করে গ্রীষ্মকালে ফসল তোলা হয়। ভারতে সবচেয়ে বেশি গম হয় উত্তরপ্রদেশে, তারপর পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়। পশ্চিমবঙ্গেও ক্রমশ বেশি জমিতে গম চাষ হচ্ছে। গম থেকে আটা, ময়দা, সুজি ইত্যাদি পাওয়া যায় এবং তা থেকে নানারকম খাদ্যদ্রব্য তৈরি হয়।



জোয়ার, রাগি, বাজরা ঃ ভারতের প্রায় তিন ভাগের একভাগ লোকের প্রধান খাদ্য হল জোয়ার, রাগি ও বাজরা। এগুলি শুষ্ক ও মরুপ্রায় অঞ্চলের ফসল। যেখানে ২৪°-২৭° ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা এবং ৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি সেখানে এই ফসলগুলি হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজস্থান থেকে দাক্ষিণাত্য মালভূমির মধ্যভাগ পর্যন্ত সর্বত্র এর চাষ।



আখ ঃ আখ চাষের আদর্শ জলবায়ু ভারতে রয়েছে, কিন্তু উত্তর ভারতেই আখের চাষ বেশি। আখ চাষ করতে প্রায় ১১ মাস সময় লাগে

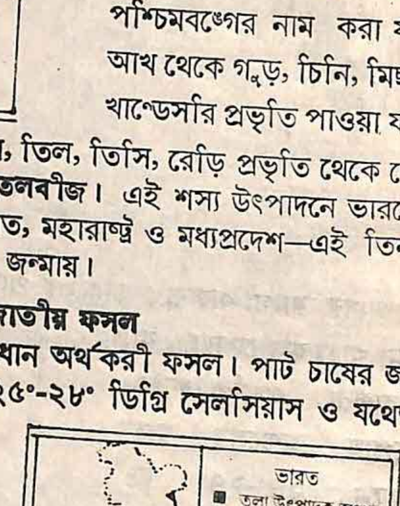
এর জন্য প্রয়োজন চুন ও লবণ মেশানো উর্বর দোআঁশ মাটি, ২১°-২৭° ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা ও ১০০-২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত। আখ উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। উৎপাদক অঞ্চলগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নাম করা যায়। আখ থেকে গুড়, চিনি, মিছরি, খাণ্ডেসরি প্রভৃতি পাওয়া যায়।



তৈলবীজ : চীনেবাদাম, সরষে, তিল, তিসি, রেড়ি প্রভৃতি থেকে তেল বার করা হয়। **এদের বলা হয় তৈলবীজ**। এই শস্য উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে **প্রথম**। গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ—এই তিনটি রাজ্যে তৈলবীজ বেশি পরিমাণে জন্মায়।

তন্তু-জাতীয় ফসল

পাট : পাট ভারতের একটি **প্রধান অর্থকরী** ফসল। পাট চাষের জন্য উর্বর নবীন পলিমাটি, উষ্ণতা **২৫°-২৮°** ডিগ্রি সেলসিয়াস ও যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ২০০-২৫০ সে.মি. প্রয়োজন। পাট উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও আসামে পাটের চাষ হয়। পাট থেকে চট, থলে, দড়ি, ত্রিপল, কার্পেট, পর্দা ইত্যাদি তৈরি হয়। পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে ভারত যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।



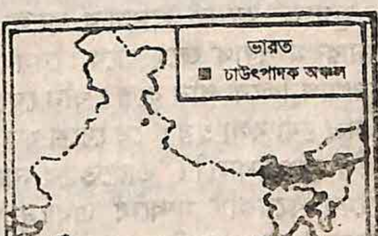
কার্পাস ঃ চুনের ভাগ বেশি এমন ধরনের উর্বর দোআঁশ মাটি ও উর্বর কালো মাটিতে চাষ হয়। ধান চাষের মতো উত্তাপ আর গম চাষের মতো বৃষ্টির জল কার্পাস উৎপাদনে সহায়তা করে। কিন্তু যখন গুটি পেকে আসে তখন শুকনো আবহাওয়া এবং যথেষ্ট রোদের তাপ প্রয়োজন। দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি অঞ্চলে কার্পাসের উৎপাদন এত বেশি যে এই অঞ্চল কালো কার্পাসমাটি নামেও পরিচিত। এ ছাড়া মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশে কার্পাসের চাষ হয়।



পানীয়-ফসল

চা ঃ ভারত প্রতি বছর প্রচুর চা বিদেশে রপ্তানি করে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

চা-এর গাছগুলি চিরসবুজ। চা চাষ করতে ২৪°-২৭° ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা এবং ২০০-২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। পাহাড়ের ঢালে যেখানে জল দাঁড়াতে পারে না ও মাটিতে লোহার ভাগ বেশি সেইরকম দোআঁশ মাটিতে চা চাষ ভালো হয়। চা গাছ থেকে পাতা তোলার কাজে মেয়েরা বেশি নিপুণ। চা উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান সবার উপরে। ভারতের শতকরা ৬০ ভাগ চা



আসামে হয়। এর পরেই পশ্চিমবঙ্গ (দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি), নীলগিরি অঞ্চল (কেরালা, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর সংযোগস্থল) প্রধান। এ ছাড়া, ত্রিপুরা, ছোটোনাগপুর, দেরাদুন, কাংড়া উপত্যকা অঞ্চলেও সামান্য চাষ হয়। সুন্দর গন্ধের জন্য দার্জিলিং-এর চা পৃথিবীখ্যাত।

কফি ঃ ভারতে পানীয়-ফসলের মধ্যে চা-এর পরই কফির স্থান। দক্ষিণ ভারতেই এর কদর বেশি। কফি চাষের জন্য লৌহকণা-মেশানো নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ ঢালু মৃত্তিকা, ৩০° ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ১৫০-২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশেও কিছু কফির চাষ হয়।

এখানে শুধু কয়েকটি প্রধান ফসলের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ভারতে আরও নানা ধরনের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। তার মধ্যে খাদ্য-ফসল যেমন—যব, ভুট্টা, ডাল ও অন্যান্য ফসলের মধ্যে রাবার, তামাক ও সিঙ্কোনার নাম করা যায়।

খনিজ সম্পদ

ভূগর্ভে অনেক জায়গায় কয়লা, খনিজ তৈল, লোহা, অভ্র প্রভৃতি নানারকম পদার্থ জমে থাকে। যেসব জায়গা থেকে এগুলি পাওয়া যায় সে জায়গাগুলিকে **খনি** বলে। খনি থেকে পাওয়া যায় বলে ওইসব পদার্থকে **খনিজ দ্রব্য** বলা হয়। যে দেশে যত বেশি খনিজ দ্রব্য আছে সে দেশ তত বেশি সম্পদশালী। ভারতে যে নানা ধরনের খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তাদের কয়েকটি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হল, যেমন—কয়লা, খনিজ তৈল, আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তামা ও অভ্র।

কয়লা ঃ ভারতে খনিজ সম্পদগুলির মধ্যে প্রথমেই কয়লার নাম করা যায়। কয়লা ইস্পাত তৈরিতে ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগে। কলকারখানা, জাহাজ, রেলগাড়ি চালাতে এবং গৃহস্থালির কাজে কয়লা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কয়লা থেকে জ্বালানি গ্যাস, পিচ, কোক, আলকাতরা, ন্যাপথালিন, স্যাকারিন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

ভারতে কয়লাখনিগুলির বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত ছড়ানো। যেসব রাজ্যে কয়লাখনি আছে সেগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু।

খনিজ তৈল : আধুনিক পৃথিবীতে খনিজ তেল এত মূল্যবান যে একে তরল সোনা বলা হয়। খনি থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাকে আমরা সোজাসুজি ব্যবহার করতে পারি না। অপরিশোধিত ওই তেলকে মোটা পাইপের সাহায্যে শোধনাগারে পাঠিয়ে পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য উপজাত দ্রব্য যেমন—মোমবাতি, বার্নিশ, নানারকম রঙ, গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধনের দ্রব্য, ছাপার কালি, ফিল্ম, কৃত্রিম রাবার, ভেসলিন, ক্রিম, প্লাস্টিক, ন্যাপথল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস খনিজ তেল থেকে পাওয়া যায়।

ভারতের সবচেয়ে বেশি খনিজ তেলের সন্ধান মেলে পশ্চিমদিকে খাম্বাত (কাম্বে) উপসাগরের ধারে আঙ্কালেশ্বর, কোশাম্বা, কলোল, লুনেজ প্রভৃতি কেন্দ্র ও মুম্বই-এর কাছে অগভীর সমুদ্রে মুম্বে-হাইয়ে। এছাড়া পূর্বভারতে সবচেয়ে পুরানো খনি ডিগবয় ও তার আশপাশের খনিগুলি যেমন নাহারকাটিয়া, মোরান, বদরপুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পূর্ব ভারতে, পূর্ব উপকূলে ও পশ্চিমবঙ্গে তৈল অনুসন্ধানের কাজ চলছে।

আকরিক লোহা : মানুষের সমাজে লোহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। খনি থেকে বা পাহাড় কেটে আকরিক লোহা বা লোহাপাথর তুলে এনে, চুনাপাথর ও কেক মিশিয়ে প্রচন্ড উত্তাপে তাকে গলিয়ে, তা থেকে প্রথমে ঢালাই লোহা ও পরে ইস্পাত তৈরি হয়।

লৌহ আকরিক পাওয়া যায় ওড়িশার গুরুমহিয়ানী, বাদামপাহাড়, সুলাইপত ; বিহারের নোয়ামুন্ডি, গয়া ; মধ্যপ্রদেশের বায়লাডিলা, দুর্গ, দাল্লি-রাজহারা ; অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর, কুডাপ্পা, কুর্ণুল ; তামিলনাড়ুর সালেম, তিরুচিরাপল্লী ; মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি, কর্ণাটকের বাবাবুদান প্রভৃতি স্থানে।

ম্যাঙ্গানিজ ঃ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত ও কাঁচশিল্পে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, জব্বলপুর ; মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা, নাগপুর, রত্নাগিরি ; কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ, সিমোগা ; ওড়িশার গাংপুর, বোনাই ; বিহারের সিংভূম ; অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম ও শ্রীকাকুলাম প্রভৃতি স্থানে ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে।

বক্সাইট ঃ বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হয়। এই অ্যালুমিনিয়াম এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক শিল্প ও গৃহস্থালির নানা কাজে লাগে। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, জব্বলপুর ; বিহারের লোহারদাগা ; মহারাষ্ট্রের থানে ; গুজরাতের জামনগর ; ওড়িশার সম্বলপুর ; তামিলনাড়ুর সালেম ; কর্ণাটকের বাবাবুদান প্রভৃতি স্থানে বক্সাইট পাওয়া যায়।

তামা ঃ বিদ্যুৎশিল্পে তামা অপরিহার্য। ভারতে সবচেয়ে বড়ো তামার খনি রাজস্থানের ক্ষেত্রীতে অবস্থিত। এছাড়া আসাম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং সিকিমে কিছু তামার সন্ধান মেলে। বিহারের মোসাবনির তাম্রখনির যথেষ্ট সুনাম আছে।

অভ্র ঃ এদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্র পাওয়া যায়। এরোপ্লেন ও মোটর গাড়ির বিভিন্ন অংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধ, রঙ প্রভৃতি তৈরির জন্য অভ্রের প্রয়োজন হয়। বিহারের গিরিডি, গয়া, হাজারিবাগ, মুঙ্গের ; রাজস্থানের ভিলোয়ারা, জয়পুর, আজমীঢ় ; কর্ণাটকের হাসান ; অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর ; তামিলনাড়ুর নীলগিরি এবং কেরালায় অভ্র পাওয়া যায়।

শিল্প

কৃষি ও শিল্পের উপর একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ লোক নানাভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। বাকি ৩০ ভাগের মধ্যে মাত্র ১১ ভাগ শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করে তোলার জন্য বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পে উন্নতি করার চেষ্টা চলছে।

ভারতের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে যে প্রধান শিল্পগুলি গড়ে উঠেছে তার কয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

কার্পাস-বস্ত্রশিল্প ঃ এটি ভারতের সবচেয়ে বড়ো শিল্প। এদেশের আর্দ্র জলবায়ু, কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ, নিপুণ শ্রমিক ও মূলধন এবং উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, সর্বোপরি প্রচুর চাহিদার জন্য এই শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৭০০-এর উপরে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সুতো কাটায় এবং দুই-তৃতীয়াংশ কাপড় বোনায় নিযুক্ত। এ ছাড়া কাপড়ের কলে ১২৮ কোটি কেজির মতো সুতো এবং ৪১৮ কোটি মিটারের মতো মিলের কাপড় তৈরি হয়।

কার্পাস-বস্ত্রশিল্পের অঞ্চলগুলিকে মোটামুটি ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা—পশ্চিম ভারত অঞ্চল (গুজরাত, মহারাষ্ট্র), দক্ষিণ ভারত অঞ্চল (তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা), মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ অঞ্চল, দিল্লি ও উত্তপ্রদেশ অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল।

বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে গুজরাতের আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এর পরেই মহারাষ্ট্রের মুম্বই-এর স্থান।

পাটশিল্প ঃ ভারতের প্রথম পাটকল চালু হয় পশ্চিমবঙ্গের রিষড়াতে। কলকাতার আশেপাশে ভাগীরথী-হুগলীর দুই তীরে ভারতের অধিকাংশ পাটকলগুলি গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রগুলির মধ্যে শ্রীরামপুর, বজবজ, বিড়লাপুর, উলুবেড়িয়া, আগরপাড়া, বরাহনগর, ভাটপাড়া প্রভৃতির নাম করা যায়। এই হুগলী শিল্পাঞ্চলে পাটকলগুলি কেন্দ্রীভূত হবার কারণগুলি হল জলপথে পাট আনার সুবিধা, অনুকূল জলবায়ু, শ্রমিক, মূলধন, উত্তম যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও চাহিদা।

সম্প্রতি পাটের চট ও থলির ব্যবহার কমে যাওয়ায় পাটশিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে। কাজেই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চট ও থলির বদলে সুদৃশ্য কার্পেট, ক্যানভাস, ত্রিপল, ম্যাটিং ইত্যাদি নানারকম জিনিসের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা চলেছে।

লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ঃ লৌহ ও ইস্পাতশিল্প এদেশের প্রধান শিল্প-গুলির একটি। ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছিল বর্ধমানের কুলটিতে। এরপরই জামশেদপুর, বার্নপুর ও ভদ্রাবতীর কারখানা গড়ে উঠে। এদের মধ্যে বিহারের জামশেদপুরের কারখানাটি সবচেয়ে বড়ো। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় ও বিদেশী সহযোগিতায়

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর, বিহারের **বোকারো**, ওড়িশার **রৌরকেল্লা** ও মধ্যপ্রদেশের **ভিলাইতে** ইস্পাত উৎপাদনের বড়ো বড়ো কারখানা গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে কর্ণাটকের ভদ্রাবতী ছাড়া অন্য সবকটি কেন্দ্রই মোটামুটি কাছাকাছি গড়ে উঠেছে। কারণ, শিল্পের জন্য যেসব উপাদান দরকার যেমন—আকরিক লোহা, কয়লা, চুনাপাথর, বিদ্যুৎশক্তি, নদীর জল, শ্রমিক, মূলধন, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদি সব সুবিধাই ঐ অঞ্চলগুলিতে পাওয়া যায়।

এইসব কারখানাগুলিতে নানা ধরনের ইস্পাত তৈরি হয়। উৎপাদন আরও বাড়াবার জন্য তিনটি বড়ো বড়ো কারখানা ও ১৫০টি ছোটো ছোটো নতুন কারখানা খোলার চেষ্টা চলছে।

বাণিজ্য

শিল্পের সঙ্গে বাণিজ্য বিশেষভাবে যুক্ত। যে দেশ শিল্পে যত উন্নত তার বাণিজ্যের পরিমাণ তত বেশি। কাজেই কোনো দেশের বাণিজ্যের পরিমাণকে ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি হিসেবে ধরা যায়।

বাণিজ্য দু' ধরনের—আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। একই দেশের দুটি অঞ্চলের মধ্যে পণ্য-বিনিময়কে **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য**, আর এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য-বিনিময়কে **বৈদেশিক বাণিজ্য** বলে।

ভারতে বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ ব্যবহৃত হয়। স্থলপথে জাতীয়, রাজ্য, জেলা ও গ্রাম-সড়কের মাধ্যমে এবং রেলপথে পণ্য-বিনিময় হয়। জলপথে নদী, খাল ও সমুদ্রপথে এবং বিমানপথে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য চলে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যে পণ্যগুলি বিনিময় হয় সেগুলি হল কয়লা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চাল, ডাল, বাদাম, মশলা, ফল, চা, শাকসবজি, গম, তেল, তামাক, তুলা, বস্ত্র, ঔষধপত্র, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, কেরোসিন তেল, ম্যাঙ্গানিজ, রাসায়নিক দ্রব্য, কাঠ প্রভৃতি।

ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য চলে সমুদ্রপথে ১০টি প্রথম শ্রেণীর বন্দর ও বিমানপথে ৪টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে। যে পণ্যগুলি বিদেশে রপ্তানি করা হয় তার মধ্যে চা,

পাট ও পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র, ধাতু ও খনিজ দ্রব্য, লোহা, তামাক, বিড়ি, জুতো, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা, ঔষধপত্র, লাক্ষা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আঠা, রেজিন প্রভৃতি। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তেল, অন্যান্য পেট্রোলজাত দ্রব্য, সার, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, লোহার জিনিস, ছাপাখানা সংক্রান্ত দ্রব্য, ফটোগ্রাফি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কাঁচা পাট, মেশিনারি, পিচবোর্ড, কাঁচা তুলা প্রভৃতি প্রধান।

অনুশীলনী

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

১। মাটি কাকে বলে? কী কী কারণে মাটি বিভিন্ন শ্রেণীর হয়? শ্রেণী হিসাবে মাটিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

২। কোন্ শ্রেণীর মাটিতে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করেন এবং কেন?

৩। ভারত কোন্ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং তার বৈশিষ্ট্য কী কী? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত কোথায় হয়?

৪। (ক) ধানের ফলনে ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে লেখো।

(খ) বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এমন একটি ফসলের নাম লেখো।

(গ) ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা কোথায় গড়ে ওঠে? স্বাধীনতার পর গড়ে উঠেছে এমন ৪টি ইস্পাত কারখানার নাম লেখ।

৫। **ভুল সংশোধন করো ঃ**

(ক) চাল ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য।

(খ) রাজস্থানে বৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বলে এই অঞ্চলে থর মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

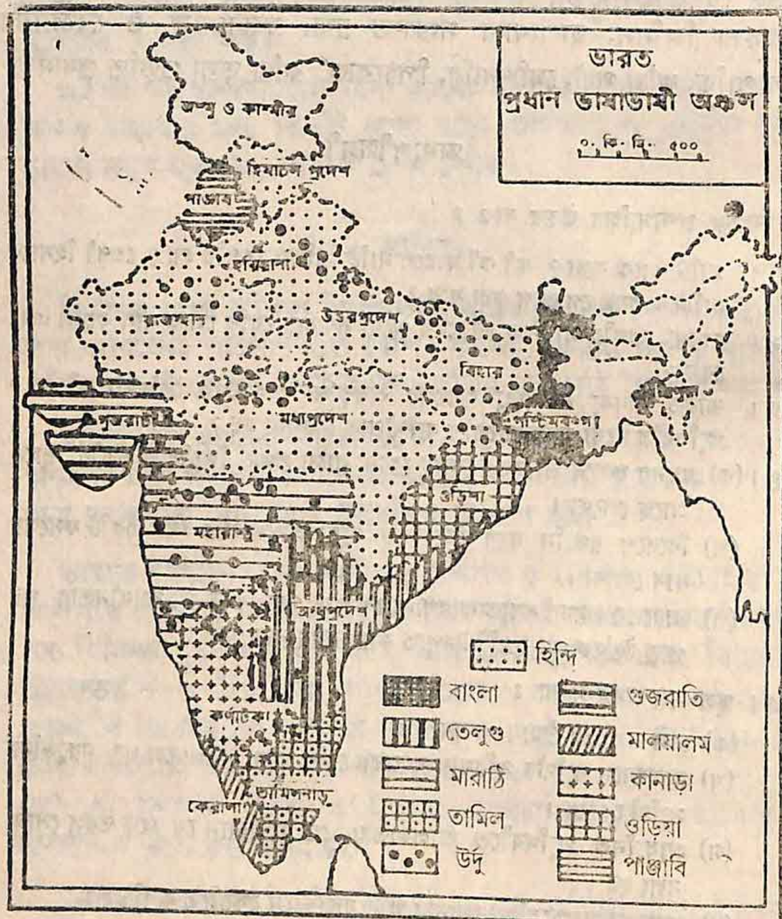
(গ) আধুনিক পৃথিবীতে আলকাতরা এত মূল্যবান যে একে তরল সোনা বলা হয়।

(ঘ) ভারতের সবচেয়ে বড় সোনার খনি রাজস্থানে ক্ষেত্রীতে অবস্থিত।

তৃতীয় অধ্যায়

দেশের মানুষ

বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক মিলন



বিভিন্ন ভাষা

৬৮ কোটি মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীতে সপ্তম হলেও জনসংখ্যায় দ্বিতীয়।

ভারত হল মিলনক্ষেত্র। যুগ যুগ ধরে কত জাতি ভারতে এসেছে। এসেছে দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, আর্য। তাদের পর পারসিক, গ্রীক, শক, হূণ, মুঘল, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরাজ ইত্যাদি কত জাতিরই না আগমন হয়েছে এই ভারতে। নানা জাতির নানা ধর্ম ও ভাষা। ভারতের বৈচিত্র্য ভাষার ক্ষেত্রেও।

ভারতে প্রায় ২২৫টি ভাষা ও উপভাষার প্রচলন আছে। এদের মধ্যে ২৩টি ভাষাই মুখ্য ভাষা এবং এই ২৩টি ভাষাতেই দেশের শতকরা ৯৭ জন মানুষ কথাবার্তা বলেন। এগুলির মধ্যে ১৫টি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানে প্রধান ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ১৫টি ভাষা হল হিন্দি, বাঙলা, তেলেগু, মারাঠি, তামিল, উর্দু, গুজরাতি, মালয়ালম, কানাড়ি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, অসমীয়া, কাশ্মীরি, সংস্কৃত ও সিন্ধি। এদের সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন হিন্দিতে। হিন্দি আর ইংরেজি হল সংযোগকারী ভাষা। আজকাল শিক্ষা ও অন্যান্য সরকারি কাজে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

প্রচলিত ভারতীয় ভাষাগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) **ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী** ও (২) **দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী**।

ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত সর্বপ্রধান ভাষা হিন্দি। হিন্দির পরই বাঙলা ভাষার স্থান। অন্যান্য ভাষাগুলি হল মারাঠি, গুজরাতি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, অসমীয়া, কাশ্মীরি, সিন্ধি প্রভৃতি। প্রধানত উত্তর ও পূর্বভারতে ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী প্রচলিত।

দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি হল তেলুগু, তামিল, কানাড়া ও মালয়ালম। ভরতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন মানুষ বিভিন্ন আর্য ও দ্রাবিড় ভাষা বলেন।

সাংস্কৃতিক মিলন

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি ও সাগর দিয়ে ঘিরে তাকে অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের সম্পদের আকর্ষণে নানা জাতি, নানা ভাষার মানুষ বিভিন্ন সময়ে এদেশে এসেছেন। তাঁদের বৈচিত্র্য শুধু কথাবার্তায় নয়, বৈচিত্র্য

সাজ-পোশাকে, আহারে-বিহারে, আচারে-ব্যবহারেও। তাই তো বিশাল উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে কেউ রাঁধেন ভাত, উত্তর-পশ্চিমে কেউ সেঁকেন রুটি, দক্ষিণে কেউ বানান ধোসা। পোশাকেও কত না বৈচিত্র্য। কেউ পরেন ধুতি, কেউ লুঙ্গি, কেউ বা পাজামা। কেউ মাথায় দেন টুপি; কেউ পরেন পাগড়ি। বাসগৃহে বৈচিত্র্যও কম নয়। বৈচিত্র্য এর আকৃতি আর প্রস্তুতির উপকরণেও। কোথাও সমতল ছাদ, আর কোথাও বা বাঁকানো ঢালু চাল। কোথাও শঙ্কু আকৃতির গৃহ, আবার কোথাও বা মাচার উপর ঘর। কোনো বাড়ি মাটির, কোনটি বা কাঠের, আবার কোনো বাড়ি হয়তো পাথরের। সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যের যেন এক সংগ্রহশালা।

ধর্মীয় আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ, সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, স্থাপত্য-শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্নতাও লক্ষ্য করার মতো. কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের সুযোগ পান। কাজেই বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য—এই আদর্শই সকল ভারতবাসীকে এক মিলনসূত্রে গেঁথেছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেই।

অনুশীলনী

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর বলো :

১। ক) ভারতে কয়টি ভাষা প্রচলিত আছে ?
খ) সংবিধানে কয়টি ভাষাকে প্রধান ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ওইগুলোর নাম বলো। কোন্ ভাষায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন ?
গ) সংযোগকারী ভাষা কোন্ কোন্‌টি ?
ঘ) ভারতীয় ভাষাগুলিকে কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ? প্রতিটি ভাগের ৩টি করে ভাষার নাম বলো।

২। শূন্যস্থান পূরণ করো :

ভারতের— —পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি ও— —"—তাকে অন্যান্য — — থেকে——করে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের——আকর্ষণে নানা জাতি, নানা —— বিভিন্ন সময়ে এদেশে এসেছেন। তাঁদের — শুধু — নয়, বৈচিত্র্য — — —।

৩। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যেসব বৈচিত্র্য দেখা যায় তা বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের প্রতিবেশী

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, তাদের ভাষা, পোশাক, গৃহ, খাদ্য ও জীবনযাত্রা—আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা

উত্তরদিকে আমাদের সবচেয়ে কাছের দেশগুলি হল চীন: নেপাল ও ভুটান ; পূর্বদিকে বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ ; দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ; পশ্চিমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। এদের মধ্যে ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একসময়ে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই পাশাপাশি দেশগুলির সঙ্গে আমাদের ভাষা, ঘরবাড়ি, খাদ্য আর জীবনযাত্রার মিল কিছুটা তো থাকবেই।

নেপাল

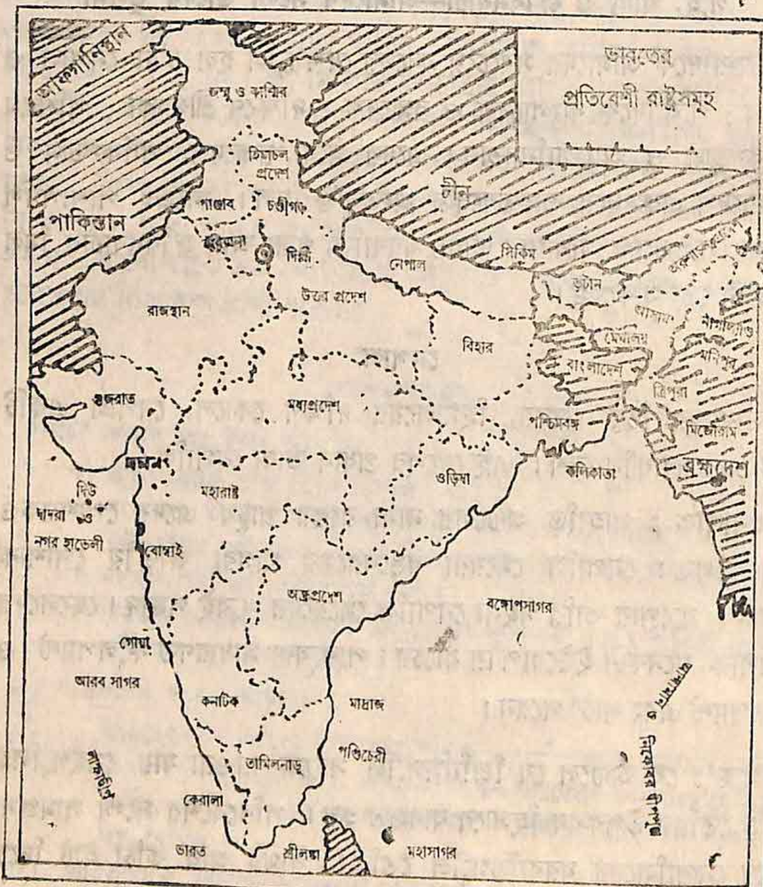
ভারতের ঠিক উত্তরে, হিমালয়ের দক্ষিণ কোলে, নেপাল একটি পর্বতময় স্বাধীন দেশ। এই দেশের প্রধান ভাষা নেপালি।

পোশাক ঃ পাহাড়ি অঞ্চলের নানা রঙের প্রাচুর্য এদের পোশাকেও প্রতিফলিত। নেপালি মেয়েরা রঙবেরঙের ঘাগরা জাতীয় পোশাক পরেন। রুপোর ভারি গহনা নেপালি মেয়েদের খুবই পছন্দ। ছেলেদের পোশাক অনেকটা ইউরোপীয় ধাঁচের। পুরুষরা সাধারণত ফুলপ্যান্ট ও হাফপ্যান্ট এবং শার্ট পরেন।

গৃহ ঃ যে অঞ্চলে যে জিনিসগুলি সহজে পাওয়া যায়, সেইগুলিই বাড়ি তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নেপালিদের ঘরবাড়িগুলি তৈরি। পাথর আর কাঁচা ইঁট দিয়ে তৈরি দোতলা বাড়িগুলোর ছাদ নিচু ও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কেবল ধনীরাই পাকা ইঁটের বাড়িতে বাস করেন।

খাদ্য ও জীবনযাত্রা ঃ আমাদের মতো নেপালিদেরও প্রধান খাদ্য ভাত। যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তারা খাদ্যের জন্য ভুট্টা অথবা জোয়ারের উপর নির্ভর করে।

নেপালিরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। তবে কিছু লোক ব্যবসায়ও করেন। পার্বত্য অঞ্চলের কঠিন জীবনযাত্রার জন্য নেপালিরা খুবই সাহসী। এ'দের মধ্যে অনেকে সেনাবিভাগে কাজ করেন। শেরপারা পর্বতারোহণে দক্ষ।



নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান

ভুটান

পূর্ব হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালে ভুটান-রাজ্য সমুদ্র-সমতল থেকে ৩০০০ মি. উপরে। রাজ্যটি আয়তনে ছোটো, নেপালের যা আয়তন, তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ।

ভাষা : ভুটানে মোট চারটি ভাষার চল আছে। উত্তর ও পশ্চিমে জোঙখা, মধ্যভাগে বুমথাওয়া, পূর্বে সারচাপ্‌য়া এবং দক্ষিণে নেপালি। এদের মধ্যে জোঙখা সরকারি ভাষা এবং এই ভাষার সঙ্গে তিব্বতি ভাষার যথেষ্ট মিল আছে।

পোশাক : ভুটানি ছেলেমেয়েরা সকলেই শীতকালে মোটা পশমের পোশাক আর গ্রীষ্মকালে মোটা সুতির বা হাল্‌কা গরম ঝোলাকোট পরেন।

গৃহ : ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরবাড়িগুলিও নানাধরনের। পার্বত্য অঞ্চলের জন্য গ্রামগুলি আকারে ছোটো ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে সমতল ছাদওয়ালা পাথরের তৈরি বাড়ি, মধ্যভাগে উপত্যকা অঞ্চলে পাথরের দেওয়াল ও ঘাসে-ঢাকা বাসগৃহ এবং আরও নিচে ডুয়ার্সের সমভূমিতে আমাদের দেশের মতো মাটির দেওয়াল ও ঘাসে-ঢাকা বাসভূমি দেখা যায়। একমাত্র শহরাঞ্চলেই কাঠের তৈরি কারুকার্যময় দোতলা বাড়ি দেখা যায়।

খাদ্য : ভাত আর মাংস ভুটানিদের প্রধান খাদ্য। পানীয় হিসাবে সকলেই চা পান করেন। চাল ও যব থেকে তৈরি **চাঙ** নামে একরকম উত্তেজক পানীয় ভুটানিদের অত্যন্ত প্রিয়।

জীবিকা : পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় ভুটানিরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু আর সাহসী। চাষবাসই ভুটানিদের প্রধান জীবিকা। পাহাড়ের ঢালগুলি চাষবাসে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে আলু আর যব এবং অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় ধান চাষ হয়। তবে পাহাড়ের ঢালে চাষবাসের জল অনেক দূর থেকে আনতে হয়। অন্যান্য উপজীবিকার মধ্যে পশু-পালন, কুটিরশিল্প ও মৃৎশিল্পের নাম করা যায়।

বাংলাদেশ

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ অবস্থিত। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখের আগে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্রে বঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল। পরে ওই দেশ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখে পূর্ব-পাকিস্তান ও ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ভাষা, পোশাক ও গৃহ ঃ এখানে বেশির ভাগ লোক বাঙালি হওয়ায় বাঙলা ভাষাই প্রচলিত। ছেলেরা ধুতি, পাজামা, শার্ট ও লুঙ্গি পরেন। মেয়েরা শাড়ি আর ব্লাউজ পরেন।

মাটির দেওয়াল, খড়, ছন বা খোলা (এক ধরনের টালি) দিয়ে ঢাকা ঢালু চাল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য। এখানে বৃষ্টি বেশি, কাজেই ঢালু চাল দিয়ে সহজেই জল গড়িয়ে পড়ে।

খাদ্য ও জীবিকা ঃ বাংলাদেশ নদীমাতৃক। চাষবাসই এদেশের প্রধান জীবিকা। এ ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকার মধ্যে ব্যবসা, বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও কুটিরশিল্পের নাম করা যায়।

ব্রহ্মদেশ

একসময়ে ব্রহ্মদেশ ভারতেরই অংশ ছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি স্বাধীন ব্রহ্মদেশ ইউনিয়নের জন্ম হয় এবং ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভাষা ঃ ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বর্মি। শতকরা ৮০ জন ওই ভাষায় কথাবার্তা বলেন। বর্মি সংবিধানে ধর্মের স্বাধীনতা আছে।

পোশাক ঃ ব্রহ্মদেশের নারী ও পুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরেন। মেয়েরা গায়ে খাটো-হাতা কোট, মাথায় নানা কারুকার্য-করা একটুকরো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধেন।

গৃহ, খাদ্য ও জীবিকা : ব্রহ্মদেশের প্রায় ৬০ ভাগ অঞ্চল বনভূমি। সেগুন কাঠ বর্মার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এই কাঠ আর বাঁশ গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ।

ধান উৎপাদনে ব্রহ্মদেশের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। নদ-নদীর মোহনায় আর উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের মতোই ভাত আর মাছ বর্মিদেরও প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য।

প্রধান জীবিকা কৃষি হলেও নানারকম শিল্প যেমন, চালকল, কাঠের কারখানা, কাপড়ের কল ইত্যাদিতেও অনেকে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীলঙ্কা

অনেক যুগ আগে শ্রীলঙ্কা দাক্ষিণাত্য মালভূমিরই অংশ ছিল। পরে পক্-প্রণালী দ্বারা মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

ভাষা ও পোশাক : শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা সিংহলি। এদেশের পুরুষেরা অনেকে ইউরোপীয় পোশাক পরেন। তবে দক্ষিণ ভারতের পুরুষদের মতো লুঙিগর কায়দায় ধুতি পরার চলও আছে। মেয়েরা শাড়ি-ব্লাউজ পরেন। আবার দক্ষিণ ভারতের মেয়েদের মতো কাছা দিয়ে শাড়ি পরার রেওয়াজও আছে।

গৃহ, খাদ্য ও জীবিকা : এদেশে বাসগৃহ তৈরিতে কাঠ, বাঁশ, বেত, খড় আর পাতা ব্যবহৃত হয়। ঘরের দেওয়াল মাটির বা কাঠের এবং ঘরের চাল তৈরিতে খড়, লতাপাতা, টিন আর টালি লাগে। অনেক চাল বেশ নিচু।

ধান চাষ সিংহলিদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। সমুদ্র আর পুকুরে মাছও আছে। কাজেই ভাত আর মাছ শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

চাষবাস, মাছধরা, মুক্তাসংগ্রহ এবং কুটিরশিল্প অধিবাসীদের বিভিন্ন উপজীবিকা।

পাকিস্তান

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বদিকের অংশ নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭১

খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম-পাকিস্তান পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়েছে।

ভাষা ও পোশাক : পাকিস্তানের প্রধান ভাষা উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বালুচ ও পুশতু। সরকারি ভাষা উর্দু। এদেশে পুরুষেরা চুড়িদার পাজামা, শেরোয়ানি আর কুর্তা ব্যবহার করেন, আর মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ আর ওড়না পরেন। তবে শাড়ির ব্যবহারও আছে।

গৃহ, খাদ্য ও জীবনযাত্রা : ইঁট, কাঠ ও পাথর দিয়ে বেশির ভাগ বাড়ি তৈরি। ধনীরা পাকা ইঁটের বাড়িতে বাস করেন।

এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য গমের রুটি আর চাপাটি। দুধ আর ঘিয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট বেশি।

কৃষিই প্রধান জীবিকা। গম আর ধান প্রধান খাদ্যশস্য। অন্যান্য উপজীবিকার মধ্যে পশুপালন, মাছ-শিকার, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, কুটিরশিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আফগানিস্তান

জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম সীমায় আফগানিস্তান অবস্থিত। সংস্কৃতি আর রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীনকালেও ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে আফগানিস্তানের উল্লেখ আছে।

ভাষা, পোশাক, গৃহ, খাদ্য ও জীবনযাত্রা : আফগানিস্তানে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত যেমন—পুশতু, তুরানি, পারসিক প্রভৃতি।

এখানে শীত খুব বেশি। সেজন্য মোটা পশমের পোশাক পরতে হয়। পুরুষেরা আলখাল্লা-জাতীয় পোশাক, পাজামা, প্যান্ট আর কুর্তা ব্যবহার করেন। মেয়েরা সালোয়ার আর কামিজ পরেন।

পাহাড়ের গায়ে বা উপত্যকা অঞ্চলে পাথর, কাঠ ও ইঁট দিয়ে বেশির ভাগ বাড়ি তৈরি হয়। বাড়ির ছাদ নির্মাণে শ্লেট পাথর ব্যবহৃত হয়। ছাদগুলি সমতল।

গম এখানকার প্রধান ফসল। কাজেই গম, রাগি আর বজরার রুটি এবং যব আর ভুট্টার ছাতু খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয়। ফসল উৎপাদনে

আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধি আছে। পেস্তা, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে এখান থেকে আমাদের দেশে আমদানি করা হয়। অধিবাসীরা কিছু সংখ্যক চাষবাসে ও কিছু সংখ্যক নানা কলকারখানায় কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন।

অনুশীলনী

শুদ্ধ করে লেখো :

১। ক) ভারতের ঠিক দক্ষিণে, হিমালয়ের দক্ষিণ কোণে নেপাল একটি পর্বতময় রাজ্য।
খ) নেপালের প্রধান ভাষা হিন্দি।
গ) নেপালের সরকারি ভাষা ইংরেজি।
ঘ) নেপালি মেয়েরা রঙবেরঙের শাড়ি আর জামা পরেন। পুরুষেরা সচরাচর ধুতি, পাঞ্জাবি পরেন।
ঙ) কেবলমাত্র গরিবরাই পাকা ইঁটের বাড়িতে বাস করেন।
চ) নেপালিদের প্রধান খাদ্য গম।
ছ) ভুটানিদের প্রধান জীবিকা ব্যবসা।
জ) চাল ও যব থেকে তৈরি 'চা' নামে একপ্রকার উত্তেজক পানীয় ভুটানিদের অত্যন্ত প্রিয়।

২। ক) বাংলাদেশ ভারতের কোন্ দিকে ? বাংলাদেশের আগে কী নাম ছিল ? এই দেশ কোন্ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? কোন্ তারিখে পৃথক হল ?
খ) বাংলাদেশের লোকের প্রধান খাদ্য কী ? এই দেশের লোকদের কী বলা হয় ? এঁরা কোন্ ভাষায় কথা বলেন ? এঁদের পোশাক কেমন ?
গ) ব্রহ্মদেশ আগে কোন্ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? কোন্ সালে এই দেশকে পৃথক করা হয় ? বর্মার রাষ্ট্রীয় ভাষা কী ? ব্রহ্মদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য কী ? বর্মিদের প্রধান খাদ্য কী ?
ঘ) শ্রীলঙ্কা ভারতের কোন্ দিকে অবস্থিত ? শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা কী ? সিংহলিদের প্রধান জীবিকা কী ?
ঙ) কোন্ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় ? পাকিস্তানের প্রধান ভাষা কী ? এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কী ?
চ) আফগানিস্তান ভারতের কোন্ দিকে অবস্থিত ? আফগানিস্তানে কয় রকম ভাষা প্রচলিত আছে ? এখানকার আবহাওয়া কী রকম ? এখানকার প্রধান ফসল কী ? এখানে কী কী ফল পাওয়া যায় ?

পঞ্চম অধ্যায়

আমাদের পৃথিবী

মহাদেশ, মহাসাগর, মহাশূন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ঃ ভারতবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল।

মহাদেশ, মহাসাগর ও মহাশূন্য

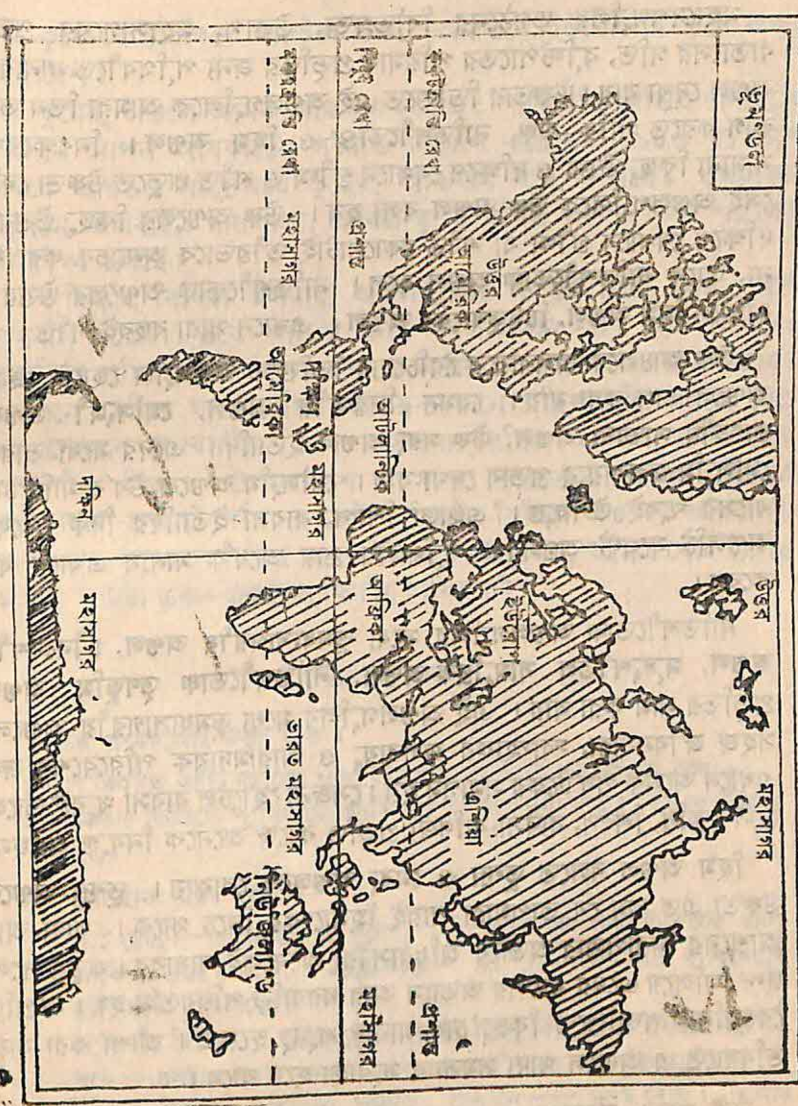
জল, স্থল আর বাতাস—এই নিয়ে আমাদের পৃথিবী। এর মধ্যে স্থলভাগ শতকরা ২৯ ভাগ, জলভাগ শতকরা ৭১ ভাগ। অর্থাৎ মোট তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল। জলভাগের মধ্যে তিনটি বড়ো মহাসাগর হল—**প্রশান্ত, আটলান্টিক** আর **ভারত মহাসাগর**। এছাড়া উত্তর আর দক্ষিণ মহাসাগর এবং অনেক সাগর-উপসাগর। স্থলভাগ মোট আটটি মহাদেশ নিয়ে। সেগুলি হল এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুমেরু ও কুমেরু।

মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি ছাড়া ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে শুরু হয়েছে অনন্ত আকাশ। তার উপরে আছে মহাকাশ। এই মহাকাশের আরম্ভ যে কোথায় আর শেষই বা কোথায়, তা কল্পনা করা পৃথিবীর মানুষের ক্ষমতার বাইরে। অনন্ত শূন্য বলে একে আমরা মহাশূন্যও বলতে পারি।

অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। কাজেই মহাশূন্য কী, এখানকার রহস্য পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতও এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে পিছিয়ে নেই। গত দু' দশকের মধ্যে মহাকাশ গবেষণা অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছে। যোগাযোগ-ব্যবস্থা, সম্পদ-সন্ধান, আবহ-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানাদিকে মহাকাশ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পেরেছে। আর এই উপযুক্ত ব্যবহারের চাবিকাঠি রয়েছে মানুষেরই হাতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ঃ ভারতবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল

মহাদেশ ও মহাসাগরগুলিকে বেষ্টন করে বায়ুমণ্ডল রয়েছে। এটা পৃথিবীরই অংশ। **বারিমণ্ডল, শিলামণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল**—এই নিয়েই পৃথিবী।


ভূমণ্ডল
উত্তর মহাসাগর
উত্তর আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
কর্কটক্রান্তি রেখা
আটলান্টিক
আফ্রিকা
প্রশান্ত
বিষুব রেখা
প্রশান্ত
মহাসাগর
দক্ষিণ আমেরিকা
ও মহাসাগর
মকরক্রান্তি রেখা
মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
নিউজিল্যাণ্ড
দক্ষিণ মহাসাগর

মহাদেশগুলির ভূগঠনের বিভিন্নতা, উত্তাপ, মহাসাগরের প্রভাব, বাতাসের গতি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রভৃতির জন্য পৃথিবীতে নানারকম অঞ্চল দেখা যায়। উষ্ণতার ভিত্তিতে এই অঞ্চলগুলিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—**উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ও হিম অঞ্চল।** নিরক্ষরেখার সামান্য কিছু উত্তর ও দক্ষিণে যেখানে গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে উষ্ণতা বেশি, সেই অঞ্চলগুলিকে **উষ্ণ অঞ্চল** বলা হয়। উষ্ণ অঞ্চলের কিছু উত্তর ও দক্ষিণে যেখানে গ্রীষ্ম বা শীত কোনোটাই তীব্রভাবে অনুভব করা যায় না, তাকে **নাতিশীতোষ্ণ** অঞ্চল বলে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে **হিম অঞ্চল, চিরতুষারের অঞ্চল।** এখানে সারা বছরই শীত।

উষ্ণ অঞ্চলকে জলবায়ুর বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে কতগুলি ছোটো ছোটো অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন—**নিরক্ষীয় অঞ্চল, মৌসুমী অঞ্চল, ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল, উষ্ণ মরু অঞ্চল** ইত্যাদি। এদের মধ্যে ভারতে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব দেখা যায়। মৌসুমি অঞ্চলে উর্বর মাটি চাষ-বাসের খুবই উপযুক্ত। এছাড়া শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদির দিক থেকেও অঞ্চলটি যথেষ্ট অগ্রসর। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ এখানে বাস করেন।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলির মধ্যে **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, চীনদেশীয় অঞ্চল, মৃদুশীতল সামুদ্রিক অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল** প্রভৃতির নাম করা যায়। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহজ জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও আরামদায়ক পরিবেশের জন্য এখানে অনেক পর্যটকের সমাগম হয়। সেজন্য হোটেল ব্যবসা খুবই ভালো চলে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে অনেকে নিযুক্ত আছেন।

হিম অঞ্চল বলতে **তুন্দ্রা ও মেরু অঞ্চলকে** বোঝায়। **তুন্দ্রা অঞ্চলে** উষ্ণতা এত কম যে তাপমাত্রা প্রায়ই হিমাঙ্কের নিচে থাকে। খাদ্য আর আশ্রয়ের নিরাপত্তার অভাবে অধিবাসীরা অনেকেই যাযাবর। ঋতুর সংগে ছন্দ মিলিয়ে এদের খাদ্যের অভ্যাস আর ঘরবাড়ি পরিবর্তন হয়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিছু চাষ-আবাদ শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে খাদ্য সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

দুই মেরু—**সুমেরু ও কুমেরু** তীব্র শীতের জন্য সব সময়েই বরফে ঢাকা থাকে। উত্তর মেরু বা সুমেরুর কাছে গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ। দক্ষিণ মেরু

বা কুমেরুর চারদিকে **আন্টার্কটিকা** (আয়তনে ইউরোপের চেয়ে বড়ো) মহাদেশ।

কুমেরু অঞ্চলে অনেক অভিযান হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি আপন আপন অধিকারের সীমাও নির্দেশ করেছে। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতও সমুদ্রপথে কুমেরু অভিযান শুরু করেছে। ওখানকার ভূগঠন, জলবায়ু, গাছপালা, জীবজন্তু ও খনিজ সম্পদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলগুলির সর্বত্রই কিছু কিছু লোক বসবাস করেন। তবে বসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। মানবজীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি—খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় যেখানে সহজলভ্য, স্বভাবত সেখানে বসতির ঘনত্ব বেশি। আবার যেখানে চাহিদাগুলি সহজে মেটে না, সেখানে জনবসতি বিরল। সেজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রা-প্রণালীও ভিন্ন। উপমহাদেশ হিসাবে ভারতেও আমরা বিভিন্ন জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখি। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী-দের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয়দের কিছু কিছু অমিল বোধ হলেও মূলত আমরা এক—একই পৃথিবীর অধিবাসী।

অনুশীলনী

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১। পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ ও কয়টি মহাসাগর আছে তাদের নাম বলো।

২। উষ্ণতার ভিত্তিতে পৃথিবীকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়? তাদের বিবরণ দাও।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

দুই মেরু —— সুমেরু ও কুমেরু — — জন্য সব সময়েই বরফে ঢাকা থাকে। উত্তর মেরু বা সুমেরুর কাছে — দ্বীপ। দক্ষিণ মেরু বা কুমেরুর চারিদিকে — মহাদেশ।

পৃথিবীর বিভিন্ন — অঞ্চলগুলির সর্বত্রই কিছু কিছু লোক বসবাস করেন। তবে — বসতির সর্বত্র সমান নয়। মানবজীবনের — চাহিদাগুলি — — ও — - যেখানে সহজলভ্য, স্বভাবত সেখানে —— ঘনত্ব বেশি। আবার যেখানে——সহজে মেটে না, সেখানে —— বিরল।

☆ ছোটদের সবসময় পুকুর, কুয়ো এবং আগুনের কাছ থেকে দূরে রেখো।

☆ ইলেকট্রিকের তার থেকে দূরে থেকো—নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

812243

No.

G. III/92